পুণ্যের লোভ না দেখালে কে দান করবে

জহর সরকার

একশো বছরেরও বেশি আগে ব্রিটিশ পর্যবেক্ষকরা লক্ষ করেছিলেন, ‘ভারত জুড়ে বৈশাখের শুক্লপক্ষের তৃতীয় দিনে অক্ষয় তৃতীয়া পালন করা হয়। মানুষের বিশ্বাস, এই দিন স্নান করে ব্রাহ্মণকে পাখা, ছাতা এবং অর্থ দান করলে অক্ষয় পুণ্য অর্জিত হয়। ফলে এই তিথি উদ্যাপন অত্যন্ত জনপ্রিয়।’ ভারতের বহু প্রদেশে পালিত এই উত্সব হিন্দি বলয়ে আখা তীজ নামে অভিহিত। জৈনরাও এই তিথি পালন করেন, তবে আমরা এই লেখায় ‘দান’-এর উপরেই জোর দেব।

পৃথিবীতে অনেক ধর্মেই পবিত্র ক্ষণ বা পুণ্যাহের ধারণা প্রচলিত। কিন্তু হিন্দুরা শুভমুহূর্ত-এর ধারণাকে যতটা গুরুত্ব দেয় এবং সেই ক্ষণ নির্ধারণের জন্য যতটা কাঠখড় পুড়িয়ে থাকে, অন্য কেউ তার ধারে কাছে পৌঁছতে পারবে না। হিন্দুধর্মের কোনও ভ্যাটিকান বা মক্কা নেই, কোনও পোপ কিংবা খলিফা অথবা শাহি ইমাম নেই, এমন একটা অ-সংগঠিত ধর্ম শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কী করে বেঁচে আছে, সেটা বোঝার জন্যে এই ধর্মের সাধারণ রীতি ও আচারগুলিকে বোঝা দরকার। পুরোহিততন্ত্র এক অতি জটিল এবং সুবিস্তীর্ণ কাঠামোয় ধর্মবিশ্বাসীদের বেঁধে রেখেছে, এই সব রীতি ও আচার সেই বেঁধে রাখার কাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। একটা বিশেষ রীতি হল পঞ্চাঙ্গ বা পঞ্জিকা দেখে চলা। সৌর এবং চান্দ্র গণনার মিশ্রণে জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতিষ এবং নানা ধর্মীয় বিধানের সমাহারে পঞ্জিকা একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন মতের পঞ্জিকা আছে, তাদের মধ্যে হিসেবের তারতম্য আছে, কিন্তু উত্সবের কাল নির্ধারণে এবং শুভ বা অশুভ ক্ষণ গণনায় সব পঞ্জিকার হিসেবই মোটামুটি মিলে যায়।

অক্ষয় তৃতীয়া লোকবিশ্বাসের সর্বভারতীয় চরিত্রের একটি চমত্কার নিদর্শন। এবং এই তিথি হল হিন্দুদের সাড়ে তিনটি সর্বাধিক শুভমুহূর্তের অন্যতম। অন্য দুটি হল পয়লা চৈত্র এবং বিজয়া দশমী, আর কার্ত্তিকের শুক্লপক্ষের প্রথম দিনটি হচ্ছে আধখানা তিথি। কথিত আছে, এই তিথিতেই ব্যাসমুনি গণেশকে মহাভারত বলতে শুরু করেছিলেন; এই দিনেই কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বস্ত্রহরণের অমর্যাদা থেকে রক্ষা করেছিলেন; এই দিনেই সূর্যদেব পাণ্ডবদের ‘অক্ষয়পাত্র’ দান করেছিলেন, যে পাত্রের খাবার কখনও ফুরোবে না। আরও নানা উপকথা এই দিনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। অনেকের মতে এই দিন ত্রেতাযুগ শুরু হয়েছিল, আবার অনেকে বলেন সত্যযুগ। মুশকিল হল, এগুলো একটু পুরনো দিনের ব্যাপার, তর্কের মীমাংসা করতে পারেন এমন কেউ বেঁচে নেই। আবার, এই তিথিতেই নাকি গঙ্গার মর্তে অবতরণ ঘটেছিল। অন্য দিকে, কৃষ্ণ এই দিনেই পরশুরাম রূপে জন্ম নিয়েছিলেন এবং সমুদ্রের বুক থেকে জমি উদ্ধার করেছিলেন, কয়েক শতাব্দী পরে ওলন্দাজারা যেমনটা করবেন। কোঙ্কণ ও মালাবার উপকূলে অক্ষয় তৃতীয়ায় পরশুরাম এখনও পূজিত হন। বাংলায় পরশুরামের কোনও ভক্ত নেই, বোধহয় এই কারণে যে, এখানে সমস্যাটা উল্টো নদীতে পলি এবং মাটি জমে চর জেগে উঠছে, এখানে বরং পরশুরাম তাঁর কুঠার চালিয়ে পবিত্র ভাগীরথীর বুকে জমা পলি নিকেশ করতে পারতেন।

বছরের এই সময়টাতে গ্রীষ্মের তাপ বাড়তে শুরু করে, মাটি শুকিয়ে ওঠে। ওড়িশা থেকে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ ও হরিয়ানা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কৃষকরা এই দিন জমিতে লাঙল দেওয়া শুরু করেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রবীণ জাঠ কৃষিজীবীরা চাষের সরঞ্জাম নিয়ে শস্যক্ষেত্রে যান, যাওয়ার পথে পশুপাখি চোখে পড়লে তাকে সুলক্ষণ বলে গণ্য করেন। গুজরাতেও কৃষকরা এই দিন লাঙল তুলে নেন এবং পরশুরামকে স্মরণ করেন। দক্ষিণ ভারতে এই দিন চাষ শুরু করার ঐতিহ্য নেই বটে, কিন্তু সেখানেও পাঁজিতে এটি শুভতিথি

হিসেবে চিহ্নিত। সৌভাগ্যের দেবতাদের প্রসন্ন করার উদ্দেশ্যে অনেকেই এ দিন উপবাস করেন।

কৃষিতে হোক অথবা বাণিজ্যে, অক্ষয় তৃতীয়ায় সমৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয় এবং তা থেকেই বোঝা যায়, হিন্দু জীবনাদর্শে জাগতিক বিষয়কে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই দিন দেবী অন্নপূর্ণার জন্মদিন, ধনসম্পদের দেবতা কুবেরের আরাধনাও এ তিথির সঙ্গে জড়িত। কুবের এক আশ্চর্য দেবতা। তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত বিবিধ উপকথায় সমাজ-ইতিহাসের মূল্যবান রসদ আছে। ব্রাহ্মণ্য কাহিনিগুলি পশ্চিমী উপাখ্যানের মতো সরল নয়, বহুমাত্রিক, সেখানে সমাজের বিবর্তন সম্পর্কে নানা ধারণা খুঁজে নেওয়া যায়। কুবেরকে বর্ণনা করা হয় এক কুদর্শন, খর্বকায় এবং স্ফীতোদর যক্ষ রূপে। প্রথম যুগে ভারতে নবাগত আর্যদের জীবিকা ছিল পশুচারণ, সুতরাং তাঁরা ভ্রাম্যমাণ জীবন যাপন করতেন। অন্য দিকে, পুরনো অধিবাসীদের স্থায়ী বসতি ছিল, তাঁদের আর্থিক অবস্থাও ছিল আর্যদের তুলনায় সমৃদ্ধ। কিন্তু তাঁদের গায়ের রং আর্যদের মতো ফরসা নয়, এবং আর্যরা তাঁদের তুলনায় দীর্ঘাঙ্গী। দেখতে খারাপ বলে আর্যরা তাঁদের নিচু চোখে দেখতেন। বৈদিক, বেদ-উত্তর এবং পৌরাণিক কাহিনিতে অনার্য জনগোষ্ঠীর বিপুল ঐশ্বর্যের বিস্তর উল্লেখ আছে। এই সম্পদের একটা কারণ হল, তাঁরা পশুপালন এবং কৃষি থেকে অর্জিত সম্পদের একটা অংশ স্বর্ণ ও মণিরত্নের আকারে সঞ্চিত রাখতেন। অক্ষয় তৃতীয়ায় সঞ্চয় করা ও সঞ্চিত অর্থ দিয়ে সোনারূপো কেনার ঐতিহ্য এই সূত্রেই এসেছে। এর ছ'মাস পরে ধনতেরাসেও একই রীতি অনুসৃত হয়। অর্থনীতিবিদ ও লগ্নি-বাজারের উপদেষ্টারাও এই উপদেশই দেন।

কুবেরকে বৈদিক সাহিত্যে প্রথমে দেখা যায় 'ভূতেশ্বর' রূপে। দেবতা হিসেবে তাঁর স্বীকৃতি মেলে পুরাণের যুগে, হাজার বছর পরে। তত দিনে মনু-কথিত 'মিশ্র জনগোষ্ঠী' ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বসবাস করছেন। ক্রমশ কুবেরকে বৌদ্ধরা বৈশ্রবন্ত নামে এবং জৈনরা সর্বন-ভূতি নামে স্বীকৃতি দেন। লক্ষ্মী ঐশ্বর্যের দেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া অবধি কুবের হিন্দুদের কাছে সম্পদের দেবতা হিসেবে পূজিত হয়ে চলেন। দেবতাদের সম্পদরক্ষী হিসেবে তাঁর গায়ের রংও ক্রমশ পরিষ্কার হতে থাকে, যদিও তিনি গণ, যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব গুহ্যক প্রমুখ 'পশ্চাত্পদ গোষ্ঠী'র প্রতিনিধিই থেকে যান। লোকদেবতা থেকে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের উচ্চতর কোটিতে ওঠার স্পর্ধা দেখিয়েছেন তিনি, তার মূল্য দিতে হয়েছে কুবেরকে, তাঁর একটি চোখ নষ্ট হয়েছে, একেবারে মনসার মতোই। লড়াই না করে কিছু পাওয়া যায় না। অক্ষয় তৃতীয়া এবং ধনতেরাসে অনেক হিন্দু তাঁর আরাধনা করে। হিন্দুধর্ম কোনও দেবতাকেই একেবারে ছেঁটে ফেলে না, দরকার মতো একটা সাম্মানিক আসন দিয়ে এক পাশে সরিয়ে দেয়, অনেকটা রাজনৈতিক দলের কিছু কিছু প্রবীণ নেতার মতোই। প্রসঙ্গত, বৌদ্ধধর্মের আধারে কুবের দিব্যি অন্য একাধিক দেশে পৌঁছে গেছেন। জাপানে তিনি বিশামন নামে পূজিত।

অন্য অনেক প্রদেশের মতোই বাংলাতেও অক্ষয় তৃতীয়া নতুন ব্যবসায়িক উদ্যোগ সূচনার প্রশস্ত দিন হিসেবে গণ্য হয়, অনেকে এই দিন হালখাতাও করেন। আবার, কৃষ্ণকে সুদামার চিড়ে উপহার দেওয়ার কাহিনি স্মরণ করে এই দিনটিতে বড় হোক, ছোট হোক, উপহার দেওয়ার চল আছে। ১৮৩৬ সালে রেভারেন্ড কে এস ম্যাকডোনাল্ড লিখেছিলেন, 'হিন্দুদের কাছে এই দিনটি পবিত্র, কারণ শাস্ত্রমতে এই দিন ভিক্ষা বা উপহার দিলে অক্ষয় পুণ্য অর্জিত হয়, ভবিষ্যতে পাপ করলেও সেই পুণ্যফল নষ্ট হয় না, তাই কৃপণরাও এই দিন হাত উপুড় করে দেন।' এটাই আসল কথা। শীতের ফসল গোলায় চলে গেছে। এখন পুণ্যার্জনের একটা তাগিদ সৃষ্টি না করলে এবং ভবিষ্যতে পাপ করলেও সেই পুণ্য ধরে রাখার একটা 'আগাম জামিন'-এর ধর্মীয় বিধান না দিলে ধনীরা ব্রাহ্মণ বা দরিদ্র মানুষকে দান করতে চাইবে কেন?

প্রসার ভারতীর কর্ণধার। মতামত ব্যক্তিগত